Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল নবযুগ ও শেরে বাংলা

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কাসেম ফজলুল হক
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.1
Pages	০৭-২২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুল *নবযুগ* ও শেরে

Check for updates

আবুল কাসেম ফজলুল হক

একুশ বছরের ব্যবধানে *নবযুগ* পত্রিকা দুইবার প্রকাশিত হয়। দুইবারই এই পত্রিকার মালিক ছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রথমবার *নবযুগ* প্রকাশিত হয় সান্ধ্য দৈনিক হিসেবে ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই। ফজলুল হক তখন কলকাতার খ্যাতিমান আইনজীবী। ওই সময়ে নজরুল, মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে, পত্রিকাটির যুগ্মসম্পাদক ছিলেন।

দ্বিতীয়বার *নবযুগ* প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে। তখন ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং 'শেরে বাংলা' বলে জনগণের দ্বারা নন্দিত, তবে ক্ষমতার রাজনীতিতে তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষও প্রবল। নজরুল তখন সারা বাংলার সাধারণ মানুষের দ্বারা কবি হিসেবে নন্দিত ও বন্দিত। এবার নজরুলকে পত্রিকাটির সম্পাদক করা হয়।

প্রথমবার যখন *নবযুগ* প্রকাশিত হয় তখন নজরুলের সাহিত্য-জীবনের শুরু। নজরুল তখন তাঁর যৌবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন *নবযুগের* লেখায়। *নবযুগের* মাধ্যমে নজরুল স্বদেশে নবযুগ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন *নবযুগ* প্রকাশিত হয় তখন নজরুল ভগ্নস্বাস্থ্য, তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রায় অবসিত এবং যেটুকু ছিল তাও ক্ষীয়মান। সর্বোপরি তখন তিনি পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক অনটনে ও ঋণের দায়ে বিপর্যস্ত, এবং তাঁর স্ত্রী প্রায় তিন বছর ধরে পক্ষাঘাতে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী।

নবযুগ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন দেশে বিরাট গণজাগরণ। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) চেতনা তখনও বিকাশমান। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে আছে উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক জাগরণ এবং হিন্দু সমাজের ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন। বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হতে থাকে বিশ শতকের শুরু থেকেই। বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কারণে চারবছর অনেক কিছু বন্ধ ছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতেই গণজাগরণের অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে। ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবাসীর প্রতি যুদ্ধের সময়ে দেওয়া রাজনৈতিক

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। ফলে রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্রমাগত বেড়ে চলে। জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারতবাসীর অন্তর ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়। তার পরেই দেখা দেয় অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) ও খিলাফত আন্দোলন (১৯২১-২২)।

গণজাগরণের সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতায় গণজাগরণের চাহিদা অনুভব করে ফজলুল হক ১৯১৯ সালে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সমাপ্তিতে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর নজরুল সেনাবাহিনীর চাকুরি শেষে কলকাতা আসেন এবং মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বাস করেন। ১৯২০ সালে তাঁদের তরুণ মনেও পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন জেগেছিল। সে অবস্থায় মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে ফজলুল হকের কাছে যান। ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁদের দুই/ তিন দিন বৈঠকের পর নজরুলের প্রস্তাব অনুযায়ী পত্রিকার নাম স্থির করা হয় *নবযুগ*। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২০ ইঞ্চি × ২৬ ইঞ্চি সাইজের ছোট একখানা সান্ধ্য দৈনিক তাঁরা প্রকাশ করবেন। ফজলুল হকের মনেও তখন স্বদেশে নবযুগ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বহমান ছিল।

প্রথমবারের *নবযুগ*

মুজফ্ফর আহমদ তাঁর *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* গ্রন্থে তখনকার *নবযুগ* সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। পরে যাঁরা এ-সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা তাঁর দেওয়া তথ্যই ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় পর্বের *নবযুগ* সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদের *আত্মকথা* গ্রন্থে এবং আরও কোনো কোনো লেখায় কিছু তথ্য আছে।

মুজফ্ফর আহমদ উল্লেখ করেছেন :

> "ফজলুল হক সেলবর্ষী, মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুল ইসলাম ও আমি স্থায়ীভাবে কাজ করব, এ-কথা ফজলুল হক সাহেবকে বললাম। আর মঈনুদ্দিন হোসায়ন সাহেব যে প্রতিদিনই কিছু সাহায্য করবেন, একথাও তাঁকে জানানো হল। পরে আরও লোকের জোগাড় হবে সে খবরও তাঁকে দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের নামে ডিক্লারেশন নেওয়া হল।"[১]

মুজফ্ফর আহমদ আরও লিখেছেন :

> "ফজলুল হক সাহেবের একটা বড় অসুবিধা ছিল এই যে, তিনি মাসে একখানা কিংবা দুখানা চিঠি তাঁর মাকে বাংলায় লিখতেন। এটাই ছিল তাঁর বাংলা লেখার চর্চা। অবশ্য কলম হাতে নিলেই তিনি ইংরেজি লিখতে পারতেন। উঠে দাঁড়ালেই ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনর্গল সুন্দর বক্তৃতা তিনি দিতে পারতেন। তাঁর

মনে সন্দেহ হল যে আমরা মুসলমানের ছেলেরা হয়তো ভালো বাংলা লিখতে পারব না। শুরুতেই হয়তো কাগজের বদনাম হয়ে যাবে। তাই তিনি আমাদের নিকট প্রস্তাব করলেন যে প্রথমে কয়েকদিন শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি লেখানো হোক। তার জন্যে তাঁকে অবশ্য টাকা দেওয়া হবে। আমরা কিছুতেই রাজি হলাম না। ... শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নামজাদা সাংবাদিক ও বাংলা ভাষার শক্তিশালী লেখক ছিলেন। শুনেছি তান্ত্রিক সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত নাকি কেউ ছিলেন না। কিন্তু নীতিহীন ভাড়াটে লেখক ছিলেন পাঁচকড়ি বাবু। টাকা পেলে যিনি যেমন চাইতেন তেমন লেখাই তিনি লিখতেন।"[২]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আসলেই শক্তিশালী লেখক এবং তন্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল *নবযুগে* তাঁকে নিতে রাজি হননি।

পত্রিকায় যদিও সম্পাদক হিসেবে ফজলুল হকের নাম ছাপা হত তবু পত্রিকা সম্পাদনা করতেন মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল। জটিল বিষয় নিয়ে তাঁরা ফজলুল হকের সঙ্গে কিংবা ফজলুল হক তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। ফজলুল হক চাইতেন পত্রিকায় কৃষকদের পক্ষে লেখা হোক। তাঁরাও তা চাইতেন। মুজফ্‌ফর আহমদের চেতনাও অগ্রসর ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ছিলেন তিনি। তবে সেটা আরও কিছু পরের ঘটনা। তখন নজরুল বিশেষভাবে বিপ্লববাদী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। আর এঁরা দু-জনই ছিলেন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ভাবাদর্শের দ্বারাও অনুপ্রাণিত। *নবযুগ* শুরু করার আগে নজরুলের সাংবাদিকতার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। মুজফ্‌ফর আহমদ এর আগে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার* সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন।

৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান করার আগে নজরুল শিয়ারসোল রাজ স্কুলে পড়তেন। ওই স্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক ছিলেন বিপ্লববাদী ভাবাদর্শের অনুসারী এবং গুপ্ত সমিতি যুগান্তরের সঙ্গে সাংগঠনিক কাজে যুক্ত। এ জন্য তিনি এবং তাঁর এক বোন জেলও খেটেছিলেন। নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাবে নজরুল যুগান্তরের বিপ্লববাদী ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিপ্লববাদীরা অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, বেঙ্গল ভালান্টিয়ার্স কোর, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লীগ ইত্যাদি বহু দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল অনুশীলন ভেঙেই এত দল হয়েছিল। ১৯২২ সালে প্রকাশিত নজরুলের *ধূমকেতু* পত্রিকাকে যুগান্তর দলের কর্মীরা তাঁদের দলের মুখপত্র মনে করতেন। *ধূমকেতু* বিপ্লববাদই প্রচার করেছে। তার আগে সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগের* লেখাগুলোও প্রমাণ করে যে, নজরুল তখন বিপ্লববাদী ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। নজরুলের ওইসব লেখায় যে তেজবীর্যের প্রকাশ, বিপ্লববাদী প্রেরণার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ফজলুল হক বিপ্লববাদী কর্মধারার সঙ্গে কোনো সংযোগ রাখতেন বলে জানা যায় না। তবে *নবযুগে* নজরুলের প্রগতিশীল চিন্তা ও বিপ্লবী প্রেরণা তিনি সমর্থন করতেন।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই *নবযুগ* রাজনৈতিক পত্রিকা রূপে পরিচিতি লাভ করে। আর নজরুলের লেখাই ছিল এই পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ। নজরুলের চেতনা ছিল বৈপ্লবিক, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিশীল, চিন্তা ছিল আবেগপূর্ণ, ভাষাও ছিল আবেগপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও নজরুলের নতুনত্ব ছিল। কখনও কখনও সংবাদে তাঁর শিরোনাম হয়ে উঠত ছন্দোময়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ও বৈষ্ণব পদাবলীর চরণকেও তিনি আকর্ষণীয় শিরোনাম রূপে ব্যবহার করেছেন। সংবাদ নির্বাচন, সংবাদের সারসঙ্কলন, সংবাদ পরিবেশন এবং বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে নজরুলের অসাধারণত্ব ছিল। মুজফ্‌ফর আহমদের লেখায় আবেগপ্রবণতা ছিল না। তবে *নবযুগের* কোনো কোনো লেখায় তাঁরও বয়োধর্মের পরিচয় ছিল।

নবযুগের নীতি প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন : "আমরা যখন *নবযুগ* বার করি তখন ফজলুল হক সাহেব আমাদের কাগজের কোনো নীতির কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন কৃষক ও শ্রমিকের কথাও তোমাদের লিখতে হবে। .... আমরা নিজেরা লেখার যে ধারা গ্রহণ করেছিলাম সেটা অনেকটা ভাবপ্রবণ নিশ্চয়ই ছিল। দেশে যে আন্দোলন তখন চলছিল, ভাবপ্রবণতা দিয়েই আমরা সেটাকে তুলে ধরছিলেম। কোনো মত তখনও আমাদের ভিতরে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। তবে আমরা মজুরদের কথা, কৃষকদের কথা লিখেছিলেম। অভিজ্ঞতা হতেই সেসব লিখতাম। আমার মনে হয় এইসব লেখা হতেই পড়াশুনা করে কিছু বোঝার বাসনা আমার মনে জেগেছিল। নজরুলের ভালো লেখাগুলি অন্তত পুস্তক হয়ে বার হয়ে গেছে। সকলে বুঝতে পারবেন কোন্ ধরনের লেখা নজরুল *নবযুগে* লিখত। কিন্তু আমার *নবযুগের* লেখাগুলির অস্তিত্ব কোথাও নেই। খুব কম তো আমিও লিখিনি।"[৩] *নবযুগে* প্রকাশিত নজরুলের অনেকগুলো লেখা সঙ্কলিত আছে তাঁর *যুগবাণী* গ্রন্থে।

সরকার অন্তত দুইবার *নবযুগের* জামানত বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং ফজলুল হক দুইবারই জামানতের টাকার দ্বিগুণ টাকা দিয়ে *নবযুগের* জামানত পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কখনও কখনও সরকার সতর্কতাপত্র দিয়ে *নবযুগের* মালিককে সতর্ক করে দিয়েছে। প্রধানত নজরুলের লেখার জন্যই বাজেয়াপ্তি ও সতর্কতাপত্র জারি হয়েছে। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন : "যেদিন সকালে কাগজের হাজার টাকার জামিন বাজেয়াপ্ত হওয়ার খবর এলো, আমরা ভেবেছিলাম সেইদিন বিকালে আমাদের কাগজ বার করতে দেওয়া হবে। অন্য কাগজকে তাই দেওয়া হত। সেই জন্যে আমরা কপি তৈরি করেছিলাম, সবকিছু কম্পোজও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাগজ সেদিন আমাদের বার করতে দেওয়া হল না। আমি কোনো দিন ভাবপ্রবণ লেখা লিখতে পারিনে। সেদিন কিন্তু 'দুর্যোগের পাড়ি' শিরোনাম দিয়ে আমি একটি ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয় লিখে

ফেলেছিলাম। কাগজ বার না হওয়ায় আফজালুল হক সাহেব সেই লেখাটি নিয়ে গিয়ে তাঁর *মোসলেম ভারতে* ছেপে দিয়েছিলেন। *নবযুগের* জন্যে তৈরি করা সেই একটি লেখাই এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। লেখাটি আমার মেজাজের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। তা এত ভাবপ্রবণ যে, তার পুনর্মুদ্রণের কথা ভাবতেও আমার কেমন যেন বোধ হয়।"[৪]

মুজফ্‌ফর আহমদ উল্লেখ করেছেন, *নবযুগে* ভালো বাংলা লিখে তাঁরা ফজলুল হকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছিলেন। *নবযুগের* জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত ফজলুল হক নজরুলের ও আমাদের লেখা নিয়ে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। ফজলুল হকের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ উল্লেখ করেছেন : "আমাদের ভিতরে চাকুরি করার মতো ভাব একেবারেই ছিল না। আমরা কাজ করে যাচ্ছিলেম নিজেদের রাজনৈতিক কর্তব্য হিসেবে। কার কাগজ, কে মালিক – এসব কথা আমাদের মনেই উঠত না। এমনকি বেতনের জন্যেও আমাদের দিক হতে তেমন পীড়াপীড়ি ছিল না।"[৫] *নবযুগে* মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে নজরুলও জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা নিয়েই কাজ করেছিলেন। জামানত বাজেয়াপ্ত হলে দু-তিন দিন পত্রিকা বন্ধ থাকে, তারপর জামানতের দ্বিগুণ টাকা জমা দিয়ে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নজরুল *নবযুগ* ছেড়ে যান। তারপর ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে মুজফ্‌ফর আহমদ *নবযুগ* ছেড়ে যান। তাঁদের *নবযুগ* ছেড়ে যাওয়ার জন্য ফজলুল হক দায়ী ছিলেন বলে মনে হয় না। *নবযুগের* সাফল্যে কোনো কোনো মহল ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। ফজলুল হক সেলবর্শীর কিছু রহস্যজনক আচরণ, *মোসলেম ভারতের* আফজালুল হকের নজরুলকে *নবযুগ* থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, সাহিত্যিক আড্ডায় নজরুলের উপর *নবযুগ*-বিরোধী কারও কারও প্রভাব ইত্যাদি নজরুলের *নবযুগ* ছেড়ে যাওয়ার কারণ। বর্ধমানের আবুল কাসেম *নবযুগের* ব্যাপারে ফজলুল হককে প্রভাবিত করে আসছিলেন। মোজাফ্‌ফর আহমদ উল্লেখ করেছেন, নবযুগের জন্য ফজলুল হকের পেছনে আবুল কাসেম 'জোঁকের মতো' লেগেছিলেন। নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদ *নবযুগ* ছেড়ে গেলে ফজলুল হক *নবযুগ* বন্ধ করে দেন। আবু হেনা আবদুল আউয়াল *নজরুলের সাংবাদিকতা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> "এ কে ফজলুল হক নবযুগ প্রকাশ বন্ধ করে দিলে তাঁরই সহপাঠী বর্ধমানের রাজনীতিক আবুল কাসেম নতুনকরে *নবযুগ* পরিচালনার ভার নেন। .... আবুল কাসেমের সম্পাদনা-পরিচালনায় ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে *নবযুগ* নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে। মুজফফর আহমদের ভাষ্যমতে, এবার পত্রিকার পুরাতন প্রগতিশীল আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। এর প্রধান লেখক হিসেবে আনা হয় এ কে ফজলুল হকের বন্ধু ও সাংবাদিক বরিশালের প্রিয়লাল গুহকে। কিন্তু *নবযুগ*

বাজারে বিক্রি হচ্ছিল না। পরে নজরুলকে আনা হলেও কাগজ ভালো চলেনি। এর কারণ, মুজফ্‌ফর আহমদের মতে, পত্রিকার 'প্রতিক্রিয়াশীল নীতি'। নজরুলের হাতে তখন কোনো কাজ ছিল না। তিনি জীবিকার তাগিদেই সেদিন এ পত্রিকায় আবার যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে পত্রিকার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পুরো মেনে চলেননি। .... নজরুলের লেখার জন্য সরকার পর পর তিনবার সতর্ক করে দেন। এর কয়েকদিন পর নজরুল *নবযুগ* ছেড়ে দেন বা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।"[৬]

প্রথমবারের *নবযুগে* নজরুলের লেখা

নবযুগে প্রকাশিত নজরুলের কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর *যুগবাণী* গ্রন্থটি। *যুগবাণীর* প্রথম প্রকাশ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালীন বাংলা সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে। *যুগবাণী*তে সতেরোটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সঙ্কলিত আছে। এই প্রবন্ধগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিচার করলেই *নবযুগের* মাধ্যমে নজরুলের অবদানের পরিচয় পাওয়া যাবে।

যে স্পিরিট নিয়ে *নবযুগ* পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তার পরিচয় আছে নবযুগ প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে নজরুল তাঁর সমকালকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে মহাজাগরণের কাল বলে অভিহিত করেছেন। রুশ-বিপ্লব (১৯১৭), আইরিশদের বিপ্লবী সংগ্রাম, ভারতবাসীর জাগরণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে অসাধারণ আবেগপূর্ণ ও অতুলনীয় ভাষায় নজরুল দেশবাসীকে উঠে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল লিখেছেন : "ভারত যেদিন জাগিল সেদিন নিজের প্রতি চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্বাপেক্ষা অপমানিত, পদানত, ঘৃণ্য সে।"[৭] পরাধীনতাই ভারতের দুর্দশার মূল কারণ। এই দুরবস্থার মধ্যে ভারত *নবযুগের* অগ্নিরাগ দেখতে পেয়েছে। নজরুল লিখেছেন : "এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস খ্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। .... আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।"[৮] এইসব লেখায় নজরুল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। বাঙালি-চেতনাও তাঁর ছিল, তবে তা ভারতীয় মহাজাতিক ধারণার অন্তর্গত।

'দেশ গেছে দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ!' প্রবন্ধে মানুষের অন্তর্গত পশুশক্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের শক্তির সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীর হীনমন্যতাবোধ দূর করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধ ভারতবাসীকে পরাজিত মানসিকতা ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে সহায়তা করে।

'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' অত্যন্ত সুলিখিত, মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক, অসাধারণ প্রেরণাদায়ক প্রবন্ধ। নজরুল লিখেছেন : "এই সেদিন জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, সেখানে আমাদের ভাইরা বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই জালিওয়ানওয়ালাবাগের সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনাশেলের মতো আমাদের সামনে জাগিয়া থাক, ইহা খুব ভালো কথা, – কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদেরই দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে, ভারতের যে কোনো প্রান্ত হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ-কসাইয়ের আবির্ভাব মস্তবড় মঙ্গলের কথা। .... এই-যে আজ আমাদের নূতন করিয়া জাগরণ, এই-যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনা, আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূলে কে? ডায়ার। মানুষের, জাতির, দেশের যখন চরম অবনতি হয়, তখনই এইরূপ নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।"[৯] এ প্রবন্ধের শেষেও নজরুল হিন্দু-মুসলমান মিলনের আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল উদাত্ত ভাষায় লিখেছেন : 'এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার-আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই। যদি এতটুকু ঘুমের খোমার আসে, তবে যেন এই ডায়ারকে স্মরণ করিয়া আবার আমরা হুঙ্কার দিয়া খাড়া হইতে পারি, ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভের ওই আকাশের মর্মভেদী চূড়া দেখিয়া যেন মনুষ্যত্বের শক্তি আমাদের মাঝে গর্জন করিয়া ওঠে। আমাদের এ মিলন যদি মিথ্যা হয়, তবে যেন আমাদিগের সচেতন করিতে যুগে যুগে এই ডায়ারের বজ্র-বেদনার আবির্ভাব হয়। আমাদের প্রীতিবন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এ মহামিলন চিরন্তন হোক। আমরা আজ সব সঙ্কীর্ণতা, অতীতের সকল দুঃখ-ক্লেশ ভুলিয়া ভাইকে ভাইয়ের কোল বাড়াইয়া দিই। এস ভাই, আর একবার হাত ধরাধরি করিয়া এই খোলা আকাশে মুক্ত মাঠে দাঁড়াই।"[১০] মানবচরিত্রের জটিলতা সম্পর্কে নজরুলের অভিজ্ঞতা তখন অল্প। তাই *নবযুগের* এসব লেখায় আবেগের এমন বল্গাহীন অভিব্যক্তি!

'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য' নিতান্তই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নজরুল লিখেছেন : "আমাদের জননী জন্মভূমির বীরবাহু, বড় স্নেহের সন্তান তিলক আর নাই! হিন্দুস্তান কাঁপিয়া উঠিল – কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ওরে, আজ-যে তাহার বুকে তাহারই হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ধসিয়া পড়িল! .... আর্ত কান্নার রেশ যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এ মর্মভেদী কান্না প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই – ভাষা নাই! মহাবাহু মহাপুরুষ অগ্রজের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যেমন

প্রাণ ভরিয়া গলা ধরাধরি করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে, সেদিন দিনশেষে ব্যাকুল বৃষ্টিধারার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা তেমনি করিয়া কাঁদিয়াছি। .... ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল! এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই, আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই। নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই!"[১১]

যুগবাণী গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধেই কিছু না কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আবেগরঞ্জিত ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। সে বক্তব্য শুধু সমকালীন আবেগ-উত্তেজনাকেই ধারণ করেনি, সমকালীনতাকে অতিক্রম করে সেগুলোতে চিরন্তনের আকুতিও দেখা দিয়েছে। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, সমাজ ও জাতির পুনর্গঠন, স্বাধীনতার জয় ঘোষণা ও বিশ্বমানবতার পরম বিকাশের আকুতি আছে প্রতিটি প্রবন্ধের মর্মে। দু-একটি প্রবন্ধে উপস্থিত প্রয়োজনের কথাও বলা হয়েছে। যেমন 'জাতীয় শিক্ষা', 'ভাব ও কাজ', 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' ইত্যাদি। এগুলোতে নজরুল সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা বলে দেশবাসীকে উৎসাহিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলতে চেয়েছেন। নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও নঞর্থক নয়, সর্বত্র সদর্থক।

দ্বিতীয়বারের *নবযুগ* ও নজরুল

একুশ বছর পর ১৯৪১ সনে *নবযুগ* প্রকাশিত হয় ভিন্ন বাস্তবতায়। ফজলুল হক ও নজরুলের অবস্থা ও অবস্থান তখন আগের থেকে ভিন্ন।

বাংলার রাজনীতিতে ফজলুল হকের সঙ্গে খাজা নাজিমউদ্দিন ও হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির বিরোধ ছিল। সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের বিরোধ ছিল। বেঙ্গল লেজিসলেচারের ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পর কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশনের সম্মত না হওয়াতে অগত্যা মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন-মন্ত্রিসভা গঠন করে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করে বেঙ্গল মুসলিম লীগের সভাপতিও হয়েছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেসের ভূমিকা অসাম্প্রদায়িক ছিল না। সে অবস্থায় ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। তার পরেই জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের বিরোধ বাড়তে থাকে। ১৯৪১ সালে জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কায় ভাইস-রয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করেন এবং তাতে সকল প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এক্সঅফিসিও সদস্য করেন। এতে ফজলুল হক

ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ন্যাশন্যাল ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য হয়ে যান। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত ছিল যে, এই দুই দলের সদস্যরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদান করবেন না। এ অবস্থায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফজলুল হকের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে ফজলুল হক ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। জিন্নাহ-হক বিরোধ তখন দ্রুত-বর্ধমান। নাজিমউদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দি এই বিরোধকে বাড়িয়ে তুলতে তৎপর। ফজলুল হক জিন্নাহ-লিয়াকতের নেতৃত্বকে বাংলার স্বার্থ-বিরোধী মনে করতেন। তখন আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ ফজলুল হকের অনুসারীরা ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃষক-প্রজা পার্টিতে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করছিলেন। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে প্রচারে মুসলিম লীগ-সমর্থক পত্রিকাগুলো ভীষণভাবে সক্রিয় ছিল। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় তিনি জিন্নাহর সঙ্গে মতভিন্নতা প্রকাশ করতেন। লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাবে রূপান্তরিত করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন।

ওই বাস্তবতায় ফজলুল হক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। এ নিয়ে তিনি আবুল মনসুর আহমদ, আজিজুল হক নান্না মিয়া, অহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া, মাহমুদ নুরুল হুদা প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পত্রিকার নাম স্থির করা হয় *নবযুগ*, এবং পত্রিকার নীতি ও আদর্শও স্থির করা হয়। জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল *নবযুগ*। ফজলুল হক পত্রিকার সম্পাদক করতে চেয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদকে। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে আবুল মনসুর আহমদ সম্মত হননি। শেষ পর্যন্ত আবুল মনসুর সম্পাদক হিসেবে প্রস্তাব করেন কবি নজরুল ইসলামের নাম। নজরুল তখন বেকার ছিলেন এবং চরম আর্থিক কষ্টে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তখন প্যারালাইসিসে শয্যাশায়ী, তিনি নিজেও অসুখে ভুগছিলেন, তাঁর ছেলেরা ছোট ছোট, তাঁর শ্বাশুড়ী গিরিবালা দেবী সঙ্গে ছিলেন। ফজলুল হক ও অন্য সকলে আবুল মনসুরের প্রস্তাবে সম্মত হন। নজরুলও এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তাবে নজরুল সাগ্রহে সম্মত হন। নজরুলের প্রস্তাব অনুযায়ী মাসে তিনশত টাকা বেতন, পঞ্চাশ টাকা এলাউন্স, সম্পাদকের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষ ও টেলিফোন এবং আরও কিছু সুবিধা দিয়ে ফজলুল হক নজরুলকে *নবযুগের* সম্পাদক নিয়োগ করেন।

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে 'ধূমধামের সঙ্গে' দৈনিক *নবযুগের* প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন এই পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল মনসুর আহমদ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, শামসুদ্দিন আহমদ, মওলানা আহমদ আলি ও শেখ আবদুল হাকিম প্রমুখ। ক্রমে সাংবাদিক হিসেবে আরও অনেকে যুক্ত হন। আবুল মনসুর আহমদ এই পর্বের *নবযুগ* সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই অনেক কথা লিখেছেন।

এই সময় নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, কবিতা ও গান *নবযুগে* অনেক প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় ভারতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। বাঙালি জাতি ও ভারতীয় মহাজাতির ধারণা জাগরুক ছিল তাঁর মনে। সাম্য আর নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষের জয়গান তখনও তাঁর লেখার মর্মবস্তু। ভারতীয় মহাজাতির এবং বাঙালি জাতির কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের জন্য আকুতি বিরাজ করেছে নজরুলের ও অন্যদের লেখায়। স্বাস্থ্যগতভাবে এবং লেখক হিসেবে নজরুল তখন অবসিত-প্রায়। এ অবস্থায় তাঁর গদ্য লেখাগুলোতে কোথাও কোথাও আবেগ ও আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে, কবিতা নিতান্তই বক্তব্যধর্মী, গানে সুর ক্ষীয়মান – আবেগ-অনুভূতির সেই শক্তি ও সৌন্দর্য আর নেই। পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর (১৯৩০) পরেই যেন তাঁর শক্তি দ্রুত ক্ষয় পেয়ে যেতে থাকে। দারিদ্র্যের কশাঘাত ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পীড়িত জীবনে নজরুল, বুলবুলের মৃত্যুর পর, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রীর পক্ষাঘাত দেখা দেওয়ার পর তিনি লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার গৃহী-যোগী বরদাচরণ মজুমদারের নিকট যোগসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। নজরুলের রোগের সূচনা কখন হয়েছিল বলা কঠিন ; তবে নজরুল নিশ্চয়ই তাঁর অসুস্থতা, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ার অনেক আগেই, টের পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হয়তো চরম আর্থিক অনটনের কারণেই বিজ্ঞানসম্মত ধারার চিকিৎসকের দ্বারস্থ না হয়ে টুটকা চিকিৎসা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং তাতে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজেছিলেন। নজরুল-জীবনের এই পর্বেই দ্বিতীয়বার নবযুগ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে পত্রিকায় নজরুলের নাম ছাপা হত। এ অবস্থায় কেবল নজরুলের লেখা থেকেই *নবযুগের* চরিত্র বোঝা যাবে না, অন্যদের লেখাও গুরুত্বপূর্ণ। সেকালের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্যও *নবযুগ* গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে *নবযুগ* এখন আর পাওয়া যায় না। *নবযুগ* সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আত্মকথা* গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তা-ছাড়াও এ-বিষয়ে তাঁর আরও অন্তত তিনটি প্রবন্ধ আছে। মনে হয় এ পর্বে *নবযুগের* সম্পাদকের দায়িত্ব অনেকটাই আবুল মনসুর আহমেদকে পালন করতে হয়েছে। তিনি নিজেকে *নবযুগের* 'বেনামী' সম্পাদক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এক পর্যায়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য *নবযুগ* থেকে তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। *নবযুগ* অফিসে নজরুলের আধ্যাত্মিক প্রবণতা ও রোগলক্ষণ দেখে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

> "ইতিমধ্যে নজরুল ইসলাম সাহেবের মধ্যে একটু একটু মস্তিস্ক-বিকৃতি দেখা দিল। আগেই শুনিয়াছিলাম, বরদাবাবু নামক জনৈক হিন্দু যোগীর নিকট তান্ত্রিক যোগসাধনা শুরু করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে কাজী সাহেব মিষ্টি হাসি

হাসিতেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চল ছাদ-ফাটানো হাসি তিনি আর হাসিতেন না। তার বদলে উঁচু স্তরের এমনসব আধ্যাত্মিক কথা বলিতেন যা সংবাদপত্র অফিসে মোটেই মানায় না। একদিন অফিসে আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন – একটা জায়নামাজ ও ওজুর জন্য একটা বদনা কিনাইয়া দিন। তাই করা হইল। অফিসে দোতলার পিছন দিকে একটি ছোট কামরাকে নামাজের ঘর করা হইল। কাজী সাহেব সপ্তাহে দু-চারদিন যা আসিতেন এবং দুই-তিন ঘণ্টা যা থাকিতেন তার সবটুকুই তিনি ওজু ও নামাজে কাটাইতেন। ওজু করিতে লাগিত কমছে-কম আধ ঘণ্টা। আর নামাজে ঘণ্টা দুই। এ নামাজের কোনো ওয়াক্ত-বেওয়াক্ত ছিল না। কেরাত রুকু সেজদা ছিল না। জায়নামাজে বসিয়া হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিতেন এবং তার পরেই মাটিতে মাথা লাগাইতেন, সেজদার মতো কোমর উঁচা করিয়া নয়, কোমর উরুর সাথে ও জমির সাথে মিশাইয়া। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সিজদায় কাটাইয়া দিতেন। আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাতে সিজদা শেষ করিয়া একবারই মাথা উঠাইতেন। আমাদের দুশ্চিন্তার মধ্যেও এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে অন্তত তান্ত্রিক সাধনা ছাড়িয়া তিনি মুসলমানি এবাদত ধরিয়াছেন।”[১২]

নজরুলের আধ্যাত্মিক প্রবণতার ও অস্বাভাবিক আচরণের আরও কিছু বিবরণ দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

“এরপর কাজী সাহেব অফিসে আসা একদম বন্ধ করে দিলেন। শুধু বেতন নিবার নির্ধারিত তারিখে রশিদ সই করিয়া টাকা নিতে আসিতেন। তাও খবর দিয়া আনিতে হইত। কয়েক মাস পরে তাও বন্ধ করিলেন। লোক পাঠাইয়া বেতনের টাকা নিতে লাগিলেন।”[১৩]

নবযুগের এ পর্বে *নবযুগে* প্রকাশিত নজরুলের বেশ কিছু কবিতা, গান ও প্রবন্ধ নজরুল রচনাবলীতে সঙ্কলিত আছে। ‘আজ চাই কি?’ শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্ভবত প্রথম পর্বের সান্ধ্যকালীন *নবযুগে* প্রকাশিত হয়েছিল, পরে *নবযুগের* দ্বিতীয় পর্বে কোনো সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। *নবযুগ* পাওয়া গেলে এবং তার সঙ্গে বিভিন্নজনের স্মৃতিকথা, মন্তব্য ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলে অনেক কিছু বোঝা যেত।

নবযুগে ফজলুল হকের অনুসারীরা তাঁকে মুসলিম লীগ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। আবুল মনসুর আহমদ *আত্মকথায়* উল্লেখ করেছেন : নজরুল “জোরদার কবিতাই শুধু নয়, দুই-একটা সম্পাদকীয়ও লিখিয়া ফেলিলেন। এমনই একটার মধ্যে তিনি জিন্নাহ সাহেবকে ‘কাফের’ পাকিস্তানকে ‘ফাঁকিস্তান’ বলাতে মুসলিম লীগ মহলে আগুন লাগিল। .... নজরুল ইসলামের লেখায় কাজ হইল। হক সাহেব ও জিন্নাহ সাহেবের মধ্যে যে আপোস একরূপ চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল, কাজী সাহেবের ওই লেখাকে কেন্দ্র করিয়া সে আপোস ভণ্ডুল হইয়া গেল।”[১৪]

নজরুল সারা জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে – অভাব-অনটনের মধ্যে – জীবন কাটিয়েছেন। তাতে ব্যতিক্রম কম ছিল। দ্বিতীয় পর্বের *নবযুগে* যোগদানের সময়ে তিনি সব দিক দিয়েই চরম দুর্গতির মধ্যে ছিলেন। তাঁর জীবনে শৃঙ্খলারও অভাব ছিল। তাতে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুফী জুলফিকার হায়দার তাঁর *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়* গ্রন্থে নজরুল-পরিবারের তখনকার দুর্দশা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে লেখা নজরুলের একটি চিঠি সঙ্কলিত করেছেন। ১৯৪২ সনের ১৭ই জুলাই তারিখের চিঠি। তাতে নজরুল উল্লেখ করেছেন : "সাত মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মতো ৫/৬ ঘন্টা বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম Equity-র টাকা কারুর বাবার সম্পত্তি নয় বাংলার বাঙালির টাকা। ... হয়তো কবি ফেরদৌসির মতো জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয়-স্বজনকে।"[১৫] এই চিঠিতে *নবযুগে* নজরুলের শ্রমদানের কথা উল্লেখ থাকলেও নজরুল ফজলুল হকের দফতরে গিয়েছেন হিন্দু-মুসলিম ইকুইটি ফাণ্ড থেকে টাকা পাওয়ার জন্য। ফজলুল হক সেই টাকা হয়তো দিতে পারেননি। *নবযুগে* নজরুলের কোনো পাওনা ছিল এমন কথা নজরুল কিংবা অন্য কেউ কখনও বলেননি। ব্যক্তিগত জীবনে ফজলুল হক অসাধারণ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।[১৬] উক্ত চিঠি লেখার কয়েকদিন পরেই নজরুল সম্পূর্ণ অসুস্থ ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালের ১৭ই জুলাই তারিখেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও নজরুল ফজলুল হকের প্রতি অভিমান ব্যক্ত করে এমনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার আগে শ্যামাপ্রসাদ নজরুলকে পাঁচশত টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, এবং তাতে নজরুল খুব উপকৃত হয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদকে লিখিত চিঠিতেও নজরুল একইভাবে টাকার কথা উল্লেখ করে ফজলুল হককে অভিযুক্ত করেন। এখানে এ কথাটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ফজলুল হক *নবযুগের* সম্পাদক হিসেবে নজরুলকে বেতন-ভাতা দিতে কোনো ত্রুটি করেছিলেন, এমন কোনো কথা নজরুল কোনো চিঠিতে কিংবা অন্য কোথাও উল্লেখ করেননি। অন্য কেউও এমন কোনো কথা বলেছেন বলে জানা যায় না। *নবযুগে* নজরুলকে যে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, তুলনামূলকভাবে তা কম ছিল না।

নবযুগে যোগদান-কালে নজরুল ঋণগ্রস্ত ছিলেন – অন্তত সাত হাজার টাকা ঋণ। ক্রমে তাঁর ঋণ বাড়ছিল। একদিকে অভাব, কয়েক বছর ধরে পক্ষাঘাতে স্ত্রী শয্যাশায়ী, সন্তানেরা ছোট ছোট, তার উপর পাওনাদারদের চাপ – জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। নজরুল আশা করেছিলেন, হিন্দু-মুসলিম ইকুইটি ফাণ্ড থেকে ফজলুল হক তাঁকে টাকা দেবেন। নজরুল বলেছিলেন, *নবযুগে* যোগদানের আগে কোনো ফিল্মের মিউজিক ডিরেকশনের জন্য তিনি সাত হাজার টাকার একটি কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন, ফজলুল হক তখন বলেছিলেন, 'ঋণ শোধ করে দেওয়া হবে।' শ্যামাপ্রসাদকে লিখিত চিঠিতে

নজরুল উল্লেখ করেছেন, ওই মিউজিক ডিরেকশনের কণ্ট্রাক্ট বাদ দিয়ে তিনি *নবযুগে* যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ফজলুল হক নজরুলের জন্য ইকুইটি ফাণ্ড থেকে টাকার ব্যবস্থা করেননি। তাতে বিচলিত হয়ে, ফজলুল হককে অভিযুক্ত করে, সুফী জুলফিকার হায়দার ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, সব দিক দিয়ে বিপন্ন নজরুল চিঠি দুটো লিখেছিলেন। এ কথাটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ফজলুল হক নিজে প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন না। সম্পত্তিলিপ্সা তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে আমরা খবরের কাগজে দেখেছি দুইবার তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, বিবেচনায় রাখতে হবে যে, মুসলিম লীগের চরম বিরূপতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হয়েও ফজলুল হক তখন দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। আমরা শুনেছি পাকিস্তান-আন্দোলন সমর্থন না করাতে মুসলিম লীগের চরমপন্থীরা তখন কলকাতার রাস্তায় কারও হাতে *নবযুগ* দেখতে পেলে তাকে আক্রমণ করত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বক্তব্য নিয়ে মুসলিম লীগ তখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। *আজাদ* সক্রিয় ছিল *নবযুগের* বিরুদ্ধে। পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তপ্ত পরিবেশে কৃষক–প্রজা পার্টি পরিচিত হয়েছিল মুসলিম লীগ বিরোধী ও পাকিস্তান-বিরোধী দল হিসেবে। সে পর্যায়ে, বাংলার কোনো কোনো স্থানে কৃষক–প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের সঙ্ঘাত–সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রধান অভিযোগই ছিল যে তিনি পাকিস্তান-বিরোধী। ফজলুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে অবস্থান নেননি। ফজলুল হক তখন চলেছিলেন স্রোতের বিপরীতে – ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে কৃষক–প্রজা পার্টি দুর্বল অবস্থায় পড়ে যায়। পাকিস্তান-কালে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর ফজলুল হককে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকতে দেওয়া হয়নি এই অজুহাতে যে, ফজলুল হক পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন না।

জিন্নাহর পৌনপুনিক চাপের মধ্যেও ফজলুল হক ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেননি। এ অবস্থায় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়। বহিষ্কারের পরেই ফজলুল হক ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন এবং পত্রিকায় দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, দেশের স্বার্থেই তিনি ডিফেন্স কাউন্সিলে ছিলেন এবং দেশের স্বার্থেই তিনি ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এতে জিন্নাহ সাহেবের পুন পুন লিখিত চিঠির কোনো ভূমিকা নেই – তিনি কাজ করেছেন নিজের অন্তরের নির্দেশ অনুযায়ী।

১৯৩৮ সনে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে আবুল মনসুর আহমদকে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন – "আমি রাজনীতি বুঝিনা, রাজনৈতিক ব্যাপারে নাকও গলাই না। কিন্তু আমার অনুরোধ, হক–মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তোমরা যে অনাস্থা দিয়েছ তা অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান কর। তোমরা যা বললে সবই

রাজনীতির কথা। আমি রাজনীতির কথা বলছি না। আমি বলছি বাঙালি জাতির ভবিষ্যতের কথা। সমস্ত রাজনৈতিক সত্যের উপর আর একটা বড় সত্য আছে। সেটা বাঙালি জাতির অস্তিত্ব। বাঙালি জাতির ভবিষ্যত অস্তিত্ব নির্ভর করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর। ফজলুল হক ঐ ঐক্যেরই প্রতীক। আমি কংগ্রেসিদের ভারতীয় জাতীয়তা বুঝি না। আমি বুঝি বাঙালির জাতীয়তা। এ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র ফজলুর হক। ফজলুর হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালি। সেই সঙ্গে ফজলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাঙালিত্বের সঙ্গে খাঁটি মুসলমানত্বের অমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখিনি। ফজলুল হক আমার ছাত্র বলে এ কথা বলছি না। সত্য বলেই এ কথা বলছি। খাঁটি বাঙালিত্ব আর খাঁটি মুসলমানত্বের সমন্বয়ে ভবিষ্যত বাঙালির জাতীয়তা । ফজলুল হক ঐ সমন্বয়ের প্রতীক। এ প্রতীক তোমরা ভেঙো না। ফজলুল হকের অমর্যাদা তোমরা করো না। বাঙালি যদি ফজলুল হকের মর্যাদা না দেয়, তবে বাঙালির বরাতে দুঃখ আছে।"[১৭] আবুল মনসুর উল্লেখ করেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র কথাগুলো সমবেত অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন। আসলে তিনি গোটা বাংলার জনগণের কথা মনে নিয়েই এ কথা বলেছিলেন। ১৯২৯ সালে কবি নজরুল ইসলামকে যে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে সভাপতি করা হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'ও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার মাধ্যমে জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিল। নজরুল মুসলমান সমাজে আধুনিক চিন্তা-চেতনার সূচনা দেখে অনুভব করেছিলেন নিঁদ মহলের আঁধার পুরে ভোরের সানাই বুঝি বাজল। এস ওয়াজেদ আলি *গুলিস্তান* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এবং *ভবিষ্যতের বাঙালি* ও *The Future of Bengalees* নামে বই লিখে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় রাষ্ট্র গঠনের চেতনা জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু মহাসভা ও বেঙ্গল কংগ্রেস হিন্দু-স্বাতন্ত্র্যবাদী কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেছিল। বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ফজলুল হকের মতোই নজরুলও ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সংহতির যথার্থ প্রতীক। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের মুসলিম লেখকদেরকে সমন্বয়বাদী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী – এই দুই ধারায় বিভক্ত করেছেন। স্বাতন্ত্র্যবাদী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন তাঁদেরকে যাঁরা স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন এবং জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে বিশ্বাস করেন না। আর সমন্বয়বাদী বলতে বুঝিয়েছেন তাঁদেরকে যাঁরা হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে বিশ্বাস করেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনা দ্বারা জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতিরাষ্ট্র গঠনে আগহী। কবি নজরুল ইসলাম সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে মনে-প্রাণে সমন্বয়বাদী ছিলেন। ফজলুল হকও মনে-প্রাণে সমন্বয়বাদী ছিলেন। ফজলুল হক ও নজরুল দু-জনেই নির্যাতিত নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষদের জন্য চিন্তা ও কাজ

করেছেন। তাঁদের চিন্তার ও কাজের ধরনে ভিন্নতা ছিল। এ ধারায় নজরুল ফজলুল হকের চেয়ে অগ্রসর ছিলেন। নজরুল প্রথমে বিপ্লববাদ দ্বারা, পরে মার্কসবাদ দ্বারা, আরও পরে যোগসাধনমার্গের দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন। তবে সবকিছুই নজরুল গ্রহণ করেছিলেন স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী — নিজের মতো করে। নজরুলের যোগ সাধনার পদ্ধতি যাই হোক, প্রকৃতি বোধ হয় ইসলাম প্রভাবিত ছিল — যদিও ইসলামে ওই ধরনের যোগসাধনার কোনো স্থান নেই। ফজলুল হক মনে করতেন, সর্বজনীন কল্যাণে কাজ করতে হলে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা অপরিহার্য। তিনি ছয় বছর (১৯৩৭-৪২) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গোটা রাজনৈতিক জীবনে তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নজরুল তাঁর সাহিত্যজীবনের একবারে শুরু থেকেই নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে চলছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন বিপ্লববাদীদের সংশ্রবে, তারপর মার্কসবাদীদের। এজন্য কলকাতার বৃহত্তর লেখকসমাজ তাঁকে যথেষ্ট আপন করে গ্রহণ করেনি। বিপ্লববাদীরা ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে, ইয়ং বেঙ্গল ধারারও বাইরে, হিন্দুত্ববাদী ধারা থেকে আগত। বিপ্লববাদীদের ও মার্কসবাদীদের সঙ্গে নজরুলের সংযোগকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। হিন্দু (ব্রাহ্ম) মেয়ে বিয়ে করার ফলে এবং তাঁর পারিবারিক পরিবেশ সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানিপূর্ণ হওয়ার কারণে কলকাতার মুসলমানেরা তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিল। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও নজরুলের প্রতি বিরূপ মনের পরিচয় দিয়েছে। বৃহত্তর শিক্ষিতসমাজে ব্রাহ্মদের ছাড়া হিন্দুদের প্রসন্ন মনোভাব ছিল নজরুলের প্রতি। নজরুলের চিঠিপত্র থেকেও এসব বোঝা যায়। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে নজরুল যখন সার্বিক দুর্গতিতে পড়েন তখন কোনো মহলই তাঁকে দুর্গতি থেকে উদ্ধার করার কিংবা চালিয়ে নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি। যখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি একবারেই নির্বাক ও অচল হয়ে পড়েন তখন শ্যামাপ্রসাদ, সজনীকান্ত, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ কেউ কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন, তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন তাঁর সুস্থ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগী হয়ে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ও যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ এক মহৎ কাজ। ফজলুল হকের কাছে নজরুলের আশা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ফজলুল হক কোনো কারণে নজরুলের প্রতি বিরক্তও হয়ে থাকতে পারেন। কেবল ফজলুল হকই দুর্দিনে নজরুলকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেননি — এ কথা মোটেই ঠিক নয়। সেদিন মুসলমান-সমাজ থেকে নজরুলকে উদ্ধার করতে এবং রক্ষা করতে কে বা কারা এগিয়ে এসেছিলেন ?

তথ্যসূত্র

১. মুজফ্‌ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃ. ৩১

২. মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ৩৩

৩. মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ৩৪-৩৫

৪. মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ৩৫

৫. মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ ৪৩

৬. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, *নজরুলের সাংবাদিকতা*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৭

৭. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৬১৭

৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত, পৃ. ৬১৯-২০

৯. আবদুল কাদির সম্পাদিত, পৃ. ৬২৪

১০. আবদুল কাদির সম্পাদিত, পৃ. ৬২৭

১১. আবদুল কাদির সম্পাদিত, পৃ. ৬২৯-৩০

১২. আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৬০-৬১। এ গ্রন্থে 'নজরুল' না লিখে লেখা হয়েছে 'নযরুল'। এই বানান অনুমোদনযোগ্য নয়। এখানে উদ্ধৃতিতে 'নযরুল'-এর স্থলে 'নজরুল' করা হয়েছে।

১৩. আবুল মনসুর আহমদ, পৃ. ৩৬৪

১৪. আবুল মনসুর আহমদ, পৃ. ৩৫৬

১৫. সুফী জুলফিকার হায়দার, *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তককেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৬৩-৬৪

১৬. আবুল মনসুর আহমদের প্রবন্ধ 'শেরে বাংলা ফজলুল হক' এবং বেগম সুফিয়া কামালের কবিতা – 'দানবীর হাতেম তাই' ও প্রবন্ধ 'দানবীর ফজলুল হক' দ্রষ্টব্য। এগুলো সঙ্কলিত আছে মুহম্মদ আবদুল খালেক সম্পাদিত *শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক গ্রন্থে*। এ-গ্রন্থে সর্বত্র 'কাশেম' লেখা হয়েছে, শেরে বাংলা নিজে লিখতেন 'কাসেম'। শেরে বাংলাকে অনুসরণ করাই সমীচীন।

১৭. মুহম্মদ আবদুল খালেক সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'ফজলুল হকই খাঁটি বাঙালিত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের প্রতীক'। ঘটনাটির কথা আবুল মনসুর আহমদ পূর্বোক্ত 'শেরে বাংলা ফজলুল হক' শীর্ষক প্রবন্ধেও বর্ণনা করেছেন।